গল্প

বিবেক

মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়

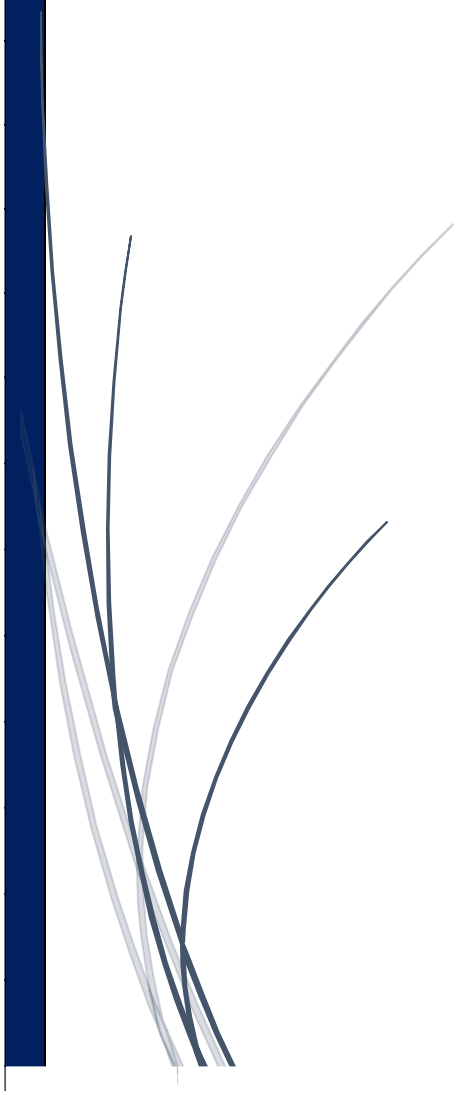

BENGALIEBOOK.COM
বেঙ্গালিইবুক.কম
bengaliebook.com
2021

বিবেক

শেষ রাত্রে একবার মণিমালার নাড়ি ছাড়িয়া যাওয়ার উপক্রম হইল। শিয়রে ঘনশ্যাম অত্যন্ত সজাগ হইয়াই বসিয়াছিল। স্ত্রীর মুখে একটু মকরধ্বজ দিয়া সে বড় ছেলেকে ডাকিয়া তুলিল।

ডাক্তারবাবুকে ডেকে নিয়ে আয় সন্তু। নিখিলবাবু যদি না আসেন, মোড়ের বাড়িটাতে যে নতুন ডাক্তার এসেছেন, ওঁকে আনিস, উনি ডাকলেই আসবেন।

ঘরে একটিও টাকা নাই, শুধু কয়েক আনা পয়সা। ভিজিটের টাকাটা ডাক্তারকে নগদ দেওয়া চলিবে না। বাড়িতে ডাক্তার আনিলে একেবারে শেষের দিকে বিদায়ের সময় তাকে টাকা দেওয়া সাধারণ নিয়ম, এইটুকু যা ভরসা ঘনশ্যামের। ডাক্তার অবশ্য ঘরে ঢুকিয়াই তার অবস্থা টের পাইবেন, কিন্তু একটি টাকাও যে তার সম্বল নাই এটা নিশ্চয় তার পক্ষে অনুমান করা সম্ভব হইবে না। মণিমালাকে ভালোভাবেই পরীক্ষা করিবেন, মরণকে ঠেকানোর চেষ্টার কোনো ত্রুটি হইবে না। বাঁচাইয়া রাখার জন্য দরকারি ব্যবস্থার নির্দেশও তাঁর কাছে পাওয়া যাইবে। তারপর, শুধু তারপর, ঘনশ্যাম ডাক্তারের সামনে দুটি হাত জোড়া করিয়া বলিবে, আপনার ফী-টা সকালে পাঠিয়ে দেব ডাক্তারবাবু–

মণিমালার সামনে অদ্ভুত ভঙ্গিতে হাতজোড় করিয়া বিড়বিড় করিয়া কথাগুলি বলিতেছে। ঘুমভরা কাঁদ-কাঁদ চোখে বড় মেয়েটা তাকে দেখিতেছে। আঙুলে করিয়া আরো খানিকটা মকরধ্বজ সে মণিমালার মুখে গুঁজিয়া দিল। ওষুধ গিলিবার ক্ষমতা অথবা চেষ্টা মণিমালার আছে, মনে হয় না। হিসাবে হয়তো তার ভুল হইয়া গিয়াছে। আরো আগে ডাক্তার ডাকিতে পাঠানো উচিত ছিল। ডাক্তারকে সে ঠকাইতে চায় না, ডাক্তারের প্রাপ্য সে দু-চার দিনের মধ্যে পাঠাইয়া দিবে, মণিমালা মরুক অথবা বাঁচুক। তবু, গোড়ায় কিছু না বলিয়া রোগিণীকে দেখাইয়া ডাক্তারের কাছে ব্যবস্থা আদায় করার হিসাবে একটু প্রবঞ্চনা আছে বৈকি। এসব হিসাবে গলদ থাকিয়া যায়।

কিন্তু উপায় কী! ডাক্তার না দেখাইয়া মণিমালাকে তো মরিতে দেওয়া যায় না।

আগুন করে হাতে পায়ে সেঁক দে লতা। কাদিস নে হারামজাদী, ওরা উঠে যদি কান্না শুরু করে, তোকে মেরে ফেলব।

মণিমালার একটি হাত তুলিয়া সে নাড়ি পরীক্ষার চেষ্টা করিল। দুহাতে দুটি রুলি এখনো তার আছে। সজ্ঞানে এ রুলি সে কিছুতেই খুলিতে দেয় নাই। কাল সন্ধ্যায় জ্ঞান প্রায় ছিল না, তখন একবার খুলিবার চেষ্টা করিয়াছিল। চোখ কপালে তুলিয়া যন্ত্রণায় মুখ বিকৃত করিয়া মণিমালাকে খাবি খাওয়ার উপক্রম করিতে দেখিয়া সাহস হয় নাই। এখন অনায়াসে খুলিয়া নেওয়া যায়। সে টেরও পাইবে না! সকালেই ডাক্তারকে টাকা দেওয়া চলিবে, ওষুধপত্র আনা যাইবে। কিন্তু লাভ কি কিছু হইবে শেষ পর্যন্ত? সেইটাই ভাবনার বিষয়। রুলি-বেচা পয়সায় কেনা ওষুধ খাইয়া জ্ঞান হইলে হাত খালি দেখিয়া মণিমালা যদি হার্ট ফেল করে!

সন্তু যখন ফিরিয়া আসিল, চারিদিক ফরসা হইয়া আসিয়াছে। মণিমালা ততক্ষণে খানিকটা সামলাইয়া উঠিয়াছিল। খুঁজিয়া নাড়ি পাওয়া যাইতেছে, নিশ্বাস সহজ হইয়া আসিয়াছে! ডাক্তার আসেন নাই শুনিয়া ঘনশ্যাম আরাম বোধ করিল।

নিখিল ডাক্তার বলিয়া দিয়াছেন, বেলা দশটা নাগাদ আসিবেন। মোড়ের বাড়ির নতুন ডাক্তারটি ডাকামাত্র উৎসাহের সঙ্গে জামা গায়ে দিয়া ব্যাগ হাতে রওনা হইতেছিলেন, হঠাৎ কী ভাবিয়া সন্তুকে জিজ্ঞাসা করিলেন, তুমি কাঁদছ কেন খোকা?

মা মরে যাবে ডাক্তারবাবু?

শেষ অবস্থা নাকি? বলে ডাক্তার নিরুৎসাহ হইয়া পড়িলেন। তারপর ভাবিয়া চিন্তিয়া চারটে টাকার জন্য সন্তুকে বাড়ি পাঠাইয়া দিয়াছেন! কাছেই তো বাড়ি। তিনি প্রস্তুত হইয়া রহিলেন, টাকা লইয়া গেলেই আসিবেন। সন্তুকে তিনি আরো বলিয়া দিয়াছেন, নগদ

চারটে টাকা যদি বাড়িতে নাও থাকে তিনটে কি অন্তত দুটো টাকা নিয়েও সে যেন যায়। বাকি টাকাটা পরে দিলেই চলিবে।

তুই কাঁদতে গেলি কেন লক্ষ্মীছাড়া?

এ ডাক্তারটি আসিলে মন্দ হইত না। ডাক্তারকে ডাক্তার, ছ্যাচড়াকে ছ্যাচড়া। টাকাটা যতদিন খুশি ফেলিয়া রাখা চলিত। একেবারে না দিলেও কিছু আসিয়া যাইত না। এসব অর্থের কাঙাল নীচু স্তরের মানুষ সম্বন্ধে ঘনশ্যামের মনে গভীর অবজ্ঞা আছে। এদের একজন তাকে মিথ্যাবাদী প্রবঞ্চক বলিয়া জানিয়া রাখিয়াছে, ভাবিলে সে গভীর অস্বস্তি বোধ করে না, মনের শান্তি নষ্ট হইয়া যায় না।

ঘরের অপর প্রান্তে, মণিমালার বিছানার হাত তিনেক তফাতে, নিজের বিছানায় গিয়া ঘনশ্যাম শুইয়া পড়িল। ভিজা ভিজা লাগিতেছে বিছানাটা। ছোট মেয়েটা সারারাত চরকির মতো বিছানায় পাক খায়, কখন আসিয়া এদিকে তার বিছানা ভিজাইয়া ওপাশে থোকার ঘাড়ে পা তুলিয়া দিয়া অকাতরে ঘুমাইতেছে। মারিবে? এখন মারিলে অন্যায় হয় না। সজোরে একটা চড় বসাইয়া দিবে ওর পিঠের ওই পাঁজরায় অথবা লোল ও তুলার আঁশ-মাখানো গালে? আধঘণ্টা ধরিয়া চিৎকার করিবে মেয়েটা। মণিমালা ছাড়া কারো সাধ্য হইবে না সহজে ওর সেই কান্না থামায়।

আধঘণ্টা মরার মতো পড়িয়া থাকিয়া ঘনশ্যাম উঠিয়া পড়িল। অশ্বিনীর কাছেই আবার সে কয়েকটা টাকা ধার চাহিবে, যা থাকে কপালে। এবার হয়তো রাগ করিবে। অশ্বিনী, মুখ ফিরাইয়া বলিবে তার টাকা নাই। হয়তো দেখাই করিবে না। তবু অশ্বিনীর কাছেই তাকে হাত পাতিতে হইবে। আর কোনো উপায়ই নাই।

বহুকালের পুরনো পোকায়-কাটা সিল্কের জামাটি দিন তিনেক আগে বাহির করা। হইয়াছিল, গায়ে দিতে গিয়া ঘনশ্যাম থামিয়া গেল। আর জামা নাই বলিয়া সে যে এই জামাটি ব্যবহার করিতেছে, এই জামা গায়ে দিয়া বাজার পর্যন্ত করিতে যায়, অশ্বিনী তা টের পাইবে না। ভাবিবে, বড়লোক বন্ধুর সঙ্গে দেখা করিতে যাইবে বলিয়া বাক্স প্যাটরা

ঘাটিয়া মান্ধাতার আমলের পোকায়-কাটা, দাগ-ধরা সিল্কের পাঞ্জাবিটি সে বাহির করিয়াছে। মনে মনে হয়তো হাসিবে অশ্বিনী।

তারচেয়ে ছেঁড়া ময়লা শার্টটা পরিয়া যাওয়াই ভালো। শার্টের ভেঁড়াটুকু সেলাই করা হয় নাই দেখিয়া ঘনশ্যামের অপূর্ব সুখকর অনুভূতি জাগিল। কাল লতাকে সেলাই করিতে বলিয়াছিল। একবার নয়, দুবার। সে ভুলিয়া গিয়াছে। ন্যায়সঙ্গত কারণে মেয়েটাকে মারা চলে। ও বড় হইয়াছে, কাদাকাটা করিবে না। কাঁদিলেও নিঃশব্দে কাঁদিবে, মুখ বুজিয়া।

লতা ইদিকে আয়। ইদিকে আয় হারামজাদী মেয়ে!

চড় খাইয়া ঘনশ্যামের অনুমানমতো নিঃশব্দে কাঁদিতে কাঁদিতে লতা শার্ট সেলাই করে, আর বিড়ি ধরাইয়া টানিতে টানিতে গভীর তৃপ্তির সঙ্গে ঘনশ্যাম আড়চোখে তার দিকে তাকায়। মায়া হয়, কিন্তু আফসোস হয় না। অন্যায় করিয়া মারিলে আফসোস ও অনুতাপের কারণ থাকিত।

অশ্বিনীর মস্ত বাড়ির বাহারে গেট পার হওয়ার সময় সবিনয় নম্রতায় ঘনশ্যামের মন যেন গলিয়া যায়। দাসানুদাস কীটাণুকীটের চেয়ে নিজেকে তুচ্ছ মনে হয়! সমস্ত ক্ষণ মর্মে মর্মে উপলব্ধি করে যে ধনহীনতার মতো পাপ নাই। রাস্তায় নামিয়া যাওয়ার পর বহুক্ষণ পর্যন্ত এই ভয়াবহ অপরাধের ভারে সে যেন দু-এক ডিগ্রি সামনে বাঁকিয়া কুঁজো হইয়া থাকে।

সবে তখন আটটা বাজিয়াছে। সদর বৈঠকখানার পর অশ্বিনীর নিজের বসিবার ঘর, মাঝখানের দরজায় পুরু দুর্ভেদ্য পরদা ফেলা থাকে। এত সকালেও বৈঠকখানায় তিনজন অচেনা ভদ্রলোক ধরনা দিয়া বসিয়া আছেন; ঘনশ্যাম দমিয়া গেল। একটু ইতস্তত করিয়া সাহসে বুক বাঁধিয়া পরদা ঠেলিয়া ঢুকিয়া পড়িল অশ্বিনীর বসিবার ঘরে। অন্দর হইতে অশ্বিনী প্রথমে এ ঘরে আসিবে।

ঘরে ঢুকিয়াই ঘনশ্যাম সাধারণভাবে বুঝিতে পারিয়াছিল ঘরে কেউ নাই। সোনার ঘড়িটার দিকে চোখ পড়ার পর আর একবার বিশেষভাবে সে বুঝিতে পারিল ঘর খালি। উনানে বসানো কেটলিতে যেমন হঠাৎ শোঁ শোঁ আওয়াজ শুরু হয় এবং খানিক পরে আওয়াজ কমিয়া জল ফুটিতে থাকে, ঘনশ্যামের মাথাটা তেমনি খানিকক্ষণ শব্দিত হইয়া থাকিয়া থাকিয়া ভাঙা ভাঙা ছাড়া ছাড়া চিন্তায় টগবগ করিয়া উঠিল। হৃৎপিণ্ড পাজরে আছাড় খাইতে শুরু করিয়াছে। গলা শুকাইয়া গিয়াছে। হাত পা কাঁপিতেছে ঘনশ্যামের। নির্জন ঘরে টেবিল হইতে তুলিয়া একটা ঘড়ি পকেটে রাখা এত কঠিন! কিন্তু দেরি করা বিপজ্জনক। ঘড়িটা যদি তাকে নিতেই হয়, অবিলম্বে নেওয়াই বুদ্ধিমানের কাজ। দেরি করিতে করিতে হয়তো শেষপর্যন্ত সে যখন ঘড়িটা তুলিয়া পকেটে ভরিতে যাইবে ঠিক সেই সময় কেহ ঘরে ঢুকিয়া সব দেখিয়া ফেলিবে। কেউ না দেখিলে তার কোনো ভয় নাই। সদ্বংশজাত শিক্ষিত। দ্রসন্তান সে, সকলে তাহাকে নিরীহ ভালোমানুষ বলিয়া জানে, যেমন হোক অশ্বিনীর সে বন্ধু। তাকে সন্দেহ করার কথা কে ভাবিবে! ঘড়ি সহজেই হারাইয়া যায়। চাকর ঠাকুর চুরি করে, সন্ন্যাসী ভিখারি চুরি করে। শেষবার ঘড়ি কোথায় খুলিয়া রাখিয়াছিল মনে পড়িয়াও যেন মনে পড়িতে চায় না মানুষের। অশ্বিনীর সোনার ঘড়ি কোথায় ছিল, কে নিয়াছে, কে বলিতে পারিবে!

তারপর ঘড়িটা অবশ্য এক সময় ঘনশ্যামের পকেটে চলিয়া গেল। বুকের ধড়ফড়ানি ও হাতপায়ের কাঁপুনি থামিয়া তখন নিজেকে তার অসুস্থ, দুর্বল মনে হইতেছে। হাঁটু দুটি যেন অবশ হইয়া গিয়াছে। পেটের ভিতর কিসে জোরে টানিয়া ধরিয়াছে আর সেই টানে মুখের চামড়া পর্যন্ত শির শির করিতেছে।

বৈঠকখানায় পা দিয়াই ঘনশ্যাম থমকিয়া দাঁড়াইয়া পড়িল। অশ্বিনীর পুরনো চাকর পশুপতি উপস্থিত ভদ্রলোকদের চা পরিবেশন করিতেছে। ঘড়িটা পকেটে রাখিতে সে যে এতক্ষণ ইতস্তত করিয়াছে, ঘনশ্যামের ধারণা ছিল না। হিসাবে একটা ভুল হইয়া গেল। পশুপতি মনে রাখিবে। এ ঘর হইতে তার বাহির হওয়া, তার থমক, চমক, শুকনো মুখ, কিছুই সে ভুলিবে না।

কেমন আছেন ঘোনোসশ্যামবাবু? চা দিই?

দাও একটু।

ধোপদুরস্ত ফরসা ধুতি ও শার্ট, পায়ে স্যান্ডেল। তার চেয়ে পশুপতিকে ঢের বেশি দ্রলোকের মতো দেখাইতেছে। ঘনশ্যামের শুধু এটুকু সান্ত্বনা যে আসলে পশুপতি চোর; অশ্বিনী নিজেই অনেকবার বলিয়াছে, সে এক নম্বরের চোর! কিন্তু কী প্রশ্রয় বড়লোকের এই পেয়ারের চোর-চাকরের! এক কাপ চা দেওয়ার সঙ্গে বড়লোক বন্ধুর চাকর যে কতখানি অপমান পরিবেশন করিতে পারে খেয়াল করিয়া ঘনশ্যামের গায়ে যেন জ্বালা ধরিয়া গেল। আজ কিন্তু প্রথম নয়। পশুপতি তাকে কোনোদিন খাতির করে না, একটা অদ্ভুত মার্জিত অবহেলার সঙ্গে তাকে শুধু সহ্য করিয়া যায়। এ বাড়িতে আসিলে অশ্বিনীর ব্যবহারেই ঘনশ্যামকে এত বেশি মরণ কামনা করিতে হয়। যে, পশুপতির ব্যবহার সম্বন্ধে সচেতন হওয়ার অবসর সে পায় না। চায়ে চুমুক দিতে। জিভ পুড়াইয়া পশুপতির বাঁকা হাসি দেখিতে দেখিতে আজ সব মনে পড়িতে লাগিল। মনের মধ্যে তীব্র জ্বালা-ভরা অনুযোগ পাক দিয়া উঠিতে লাগিল অশ্বিনীর। বিরুদ্ধে! অসহ্য অভিমানে চোখ ফাটিয়া যেন কান্না আসিবে। বন্ধু একটা ঘড়ি চুরি করিয়াছে জানিতে পারিলে পুলিশে না দিক, জীবনে অশ্বিনী তার মুখ দেখিবে না। সন্দেহ নাই। অথচ প্রথার মতো নিয়মিতভাবে যে চুরি করিতেছে সেই চাকরের কত আদর তার কাছে। অশ্বিনীর সোনার ঘড়ি চুরি করা অন্যায় নয়। ওরকম মানুষের দামি জিনিস চুরি করাই উচিত।

একঘণ্টা পরে মিনিট পাঁচেকের জন্য অশ্বিনীর সঙ্গে দেখা হইল। প্রতিদিনের মতো আজও সে বড় ব্যস্ত হইয়া আছে। মস্ত চেয়ারে মোটা দেহটি ন্যস্ত করিয়া অত্যধিক ব্যস্ততায় মেঘ-গম্ভীর মুখে হাঁসফাঁস করিতেছে। ঘনশ্যামের কথাগুলি সে শুনিল কি না বোঝা গেল না। চিরদিন এমনিভাবেই সে তার কথা শোনে, খানিক তফাতে বসাইয়া আধঘণ্টা ধরিয়া ঘনশ্যামকে দিয়া সে দুঃখ-দুর্দশার কাহিনী আবৃত্তি করায়। নিজে কাগজ পড়ে, লোকজনের সঙ্গে কথা কয়, মাঝে মাঝে আচমকা কিছুক্ষণের জন্য উঠিয়াও যায়। ঘনশ্যাম থামিয়া

গেলে তার দিকে তাকায়হাকিম যেভাবে কাঠগড়ায় ছ্যাচড়া চোর আসামির দিকে তাকায় তেমনিভাবে। জিজ্ঞাসা করে, কী বলছিলে?

ঘনশ্যামকে আবার রলিতে হয়।

আজ পাঁচ মিনিটও গেল না, নীরবে ড্রয়ার খুলিয়া পাঁচ টাকার একটা নোট বাহির করিয়া ঘনশ্যামের দিকে ছুড়িয়া দিল। ডাকিল, পশু!

পশুপতি আসিয়া দাঁড়াইলে তাকে জিজ্ঞাসা করিল, কাপড়-কাঁচা সাবান আছে?

আছে বাবু!

এই বাবুকে একখণ্ড সাবান এনে দাও। জামা-কাপড়টা বাড়িতে নিজেই একটু কষ্ট করে কেচে নিও ঘনশ্যাম। গরিব বলে নোংরা থাকতে হবে? পঁচিশ টাকা ধার চাহিলে এ পর্যন্ত অশ্বিনী তাকে অন্তত পনেরটা টাকা দিয়াছে, তার নিচে কোনোদিন নামে নাই। এ অপমানটাই ঘনশ্যামের অসহ্য মনে হইতে লাগিল। মণিমালাকে বাঁচানোর জন্য পাঁচটি টাকা দেয়, কী অমার্জিত অসভ্যতা অশ্বিনীর, কী স্পর্ধা! পথে নামিয়া ট্রাম-রাস্তার দিকে চলিতে চলিতে ঘনশ্যাম প্রথম টের পায়, তার রাগ হইয়াছে। ট্রামে উঠিয়া বাড়ির দিকে অর্ধেক আগাইয়া যাওয়ার পর সে বুঝিতে পারে, অশ্বিনীর বিরুদ্ধে গভীর বিদ্বেষে বুকের ভিতরটা সত্যই তার জ্বালা করিতেছে। এ বিদ্বেষ ঘনশ্যাম অনেকক্ষণ জিয়াইয়া রাখিবে। হয়তো আজ সারাটা দিন, হয়তো কাল পর্যন্ত।

ঘনশ্যামের একটা বৈঠকখানা আছে। একটু সঁতসেঁতে এবং ছায়ান্ধকার। তক্তপোশের ছেঁড়া শতরঞ্চিতে কিছুক্ষণ বসিয়া থাকিলে দেহ মন জুড়াইয়া যায়, চোখ আর জ্বালা করে না, ধীরে ধীরে নিশ্বাস নিতে হয়। মিনিট পনের ঘনশ্যামের প্রতীক্ষায় বসিয়া থাকার পর তার বন্ধু শ্রীনিবাস চিৎ হইয়া শুইয়া চোখ বুজিয়াছিল। আরো আধঘণ্টা হয়তো সে এমনিভাবে পড়িয়া থাকিত, কিন্তু যাওয়ার তাগিদটা মনে তার এতই প্রবল হইয়াছিল যে,

ঘনশ্যাম ঘরে ঢোকামাত্র ব্যস্তভাবে উঠিয়া বসিয়া বলিল, ভালোই হল, এসে পড়েছিস। আর এক মিনিট দেখে চলে যেতাম ভাই। ডাক্তার আনলে না?

ডাক্তার ডাকতে যাইনি। টাকার খোঁজে বেরিয়েছিলাম।

শ্রীনিবাস ক্লিষ্টভাবে একটু হাসিল।-দুজনেরই সমান অবস্থা, আমিও টাকার খোঁজেই বেরিয়েছিলাম, ওনার বালা দুটো বাঁধা রেখে এলাম। শেষ রাতে খোকারও যায় যায় অবস্থা-অক্সিজেন দিতে হল। একটু চুপ করিয়া কী ভাবিতে ভাবিতে শ্রীনিবাস আস্তে আস্তে সিধা হইয়া গেল, আচ্ছা, আমাদের সব একসঙ্গে আরম্ভ হয়েছে কেন বল তো? এক মাস আগে-পরে চাকরি গেল, একসঙ্গে অসুখ-বিসুখ শুরু হল, কাল রাত্রে এক সময়ে এদিকে সন্তুর মা, ওদিকে খোকা-

দুর্ভাগ্যের এই বিস্ময়কর সামঞ্জস্য দুই বন্ধুকে নির্বাক করিয়া রাখে। বন্ধু তারা অনেক দিনের, সব মানুষের মধ্যে দুজনে তারা সবচেয়ে কাছাকাছি। আজ হঠাৎ পরস্পরকে ঘনিষ্ঠতর-নিকটতর মনে হইতে থাকে। দুজনেই আশ্চর্য হইয়া যায়।

টাকা পেলি না?

ঘনশ্যাম মাথা নাড়িল।

গোটা দশেক টাকা রাখ। নিখিলবাবুকে একবার আনিস।

পকেট হইতে পুরনো একটা চামড়ার মানিব্যাগ বাহির করিয়া কতগুলি ভাজ-করা নোট হইতে একটি সন্তর্পণে খুলিয়া ঘনশ্যামের হাতে দিল। কিছু আবেগ ও কিছু অনির্দিষ্ট উত্তেজনায় সে নার্ভাস হইয়া পড়িয়াছে। তার স্ত্রীর বালা বিক্রির টাকা, মরণাপন্ন ছেলের চিকিৎসার টাকা। আবেগ ও উত্তেজনায় একটু কাবু হইয়া ঝোঁকের মাথায় না দিলে একেবারে দশটা টাকা বন্ধুকে সে দিতেই-বা পারিবে কেন? গেলাম ভাই। বসবার সময় নেই। একেবারে ডাক্তারবাবুকে নিয়ে যাব।

একটু অতিরিক্ত ব্যস্তভাবেই সে চলিয়া গেল। নিজের উদারতায় লজ্জা পাইয়া বোধ হয় অস্বস্তি বোধ করিতেছিল। দুমিনিটের মধ্যে আরো বেশি ব্যস্তভাবে সে ফিরিয়া আসিল। আতঙ্কে ধরা গলায় বলিল, ব্যাগটা ফেলে গেছি।

এখানে? পকেটে রাখলি যে?

পকেটে রাখবার সময় বোধ হয় পড়ে গেছে।

তাই যদি হয়, তক্তপোশে পড়িয়া থাকার কথা। ঘনশ্যামকে টাকা দিয়া পকেটে ব্যাগ রাখিবার সময় শ্রীনিবাস বসিয়া ছিল। ঘর এত বেশি অন্ধকার নয় যে, চামড়ার একটা মানিব্যাগ চোখে পড়িবে না। তবে তক্তপোশের নিচে বেশ অন্ধকার। আলো জ্বালিয়া তক্তপোশের নিচে আয়নায় প্রতিফলিত আলো ফেলিয়া খোঁজা হইল। মেঝেতে চোখ বুলাইয়া কতবার যে শ্রীনিবাস সমস্ত ঘরে পাক খাইয়া বেড়াইল। ঘনশ্যামের সঙ্গে তিনবার পথে নামিয়া দুটি বাড়ির পরে পান-বিড়ির দোকানের সামনে পর্যন্ত খুঁজিয়া আসিল। তারপর তক্তপোশে বসিয়া পড়িয়া মরার মতো বলিল, কোথায় পড়ল তবে? এইটুকু মোটে গেছি, বিড়ির দোকান পর্যন্ত। এক পয়সার বিড়ি কিনব বলে পকেটে হাত দিয়েই দেখি ব্যাগ নেই।

ঘনশ্যাম আরো বেশি মরার মতো বলিল, রাস্তায় পড়েছে মনে হয়। পড়ামাত্র হয়তো কেউ কুড়িয়ে নিয়েছে।

তাই হবে। কিন্তু এইটুকু সময়ের মধ্যে রাস্তায় পড়ল, একজন কুড়িয়ে নিল! পকেট থেকে পড়বেই-বা কেন তাই ভাবছি।

যখন যায়, এমনিভাবেই যায়। শনির দৃষ্টি লাগলে পোড়া শোল মাছ পালাতে পারে।

তাই দেখছি। বিনা চিকিৎসায় ছেলেটা মারা যাবে।

ঘনশ্যামের মুখের চামড়ায় টান পড়িয়া শিরশির করিতে থাকে। অশ্বিনীর সোনার ঘড়িটা পকেটে ভরিবার পর এমনি হইয়াছিল। এখনো ব্যাগটা ফিরাইয়া দেওয়া যায়। অসাবধান বন্ধুর সঙ্গে এটুকু তামাশা করা চলে, তাতে দোষ হয় না। তবে দশটা টাকা দিলেও ডাক্তার লইয়া গিয়াও ছেলেকে দেখাইতে পারিবে। দশ টাকায় মণিমালার যদি চিকিৎসা হয়, ওর ছেলের হইবে না কেন!

শ্রীনিবাস নীরবে নোটটি ফিরাইয়া লইল। পকেটে রাখিল না, মুঠা করিয়া ধরিয়া বসিয়া রহিল। সমান বিপন্ন বন্ধুকে খানিক আগে যাচিয়া যে টাকা দিয়াছিল সেটা ফিরাইয়া লওয়ার সঙ্গতি-অসঙ্গতির বিচার হয়তো করিতেছে। নিরুপায় দুঃখ, ব্যাগ হারানোর দুঃখ নয়, এই দশ টাকা ফেরত লইতে হওয়ার দুঃখ, হয়তো ওর কান্না আসিবার উপক্রম হইয়াছে। ওর পক্ষে কিছুই আশ্চর্য নয়। ঘনশ্যাম মমতা বোধ করে। ভাবে, মিছামিছি ওর মনে কষ্ট দেওয়া উচিত নয়।

গোটা পঁচিশেক টাকা জোগাড় করতে পারব শ্রীনিবাস।

পারবি? বাঁচা গেল। আমি তাই ভাবছিলাম। সন্তুর মার চিকিৎসা না করলেও তো চলবে না।

শ্রীনিবাস চলিয়া যাওয়ার খানিক পরেই হঠাৎ বিনা ভূমিকায় ঘনশ্যামের সর্বাঙ্গে একবার শিহরণ বহিয়া গেল। ঝাঁকুনি লাগার মতো জোরে। শ্রীনিবাস যদি কোনো কারণে গা ঘেঁষিয়া আসিত, কোনোরকমে যদি পেটের কাছে তার কোনো অঙ্গ ঠেকিয়া যাইত! তাড়াতাড়িতে শার্টের নিচে কোচার সঙ্গে ব্যাগটা বেশি খুঁজিয়া দিয়াছিল, শ্রীনিবাসের সঙ্গে এদিক-ওদিক ঘুরিয়া খোঁজার সময় আলগা হইয়া যদি ব্যাগটা পড়িয়া যাইত! পেট ফুলাইয়া ব্যাগটা শক্ত করিয়া আটকাইতেও তার সাহস হইতেছিল, বেশি উঁচু হইয়া উঠিলে যদি চোখে পড়ে। অশ্বিনীর সোনার ঘড়ি আলগাভাবে শার্টের পকেটে ফেলিয়া রাখিয়া কতক্ষণ ধরিয়া চা খাইয়াছে, লোকের সঙ্গে আলাপ করিয়াছে, অশ্বিনীর সঙ্গে আলাপ করিয়াছে, কিন্তু এমন ভয়ঙ্কর আতঙ্ক তো একবারও হয় নাই। সেইখানেই ভয়

ছিল বেশি। তার ব্যাগ লুকানোকে শ্রীনিবাস নিছক তামাশা ছাড়া আর কিছু মনে করিত না। এখনো যদি ব্যাগ বাহির করিয়া দেয়, শ্রীনিবাস তাই মনে করিবে। তাকে চুরি করিতে দেখিলেও শ্রীনিবাস বিশ্বাস করিবে না সে চুরি করিতে পারে। কিন্তু কোনোরকমে তার পকেটে ঘড়িটার অস্তিত্ব টের পাইলে অশ্বিনী তো ওরকম কিছু মনে করিত না। সোজাসুজি বিনা দ্বিধায় তাকে চোর ভাবিয়া বসিত। ভাবিলে এখন তার আতঙ্ক হয়। সেখানে কী নিশ্চিত হইয়াই ছিল! ঘড়ির ভারে ঝুলিয়া পড়িয়াছিল পাতলা শার্টের পকেটটা। তখন সে খেয়ালও করে নাই। অশ্বিনী যদি জিজ্ঞাসা করিয়া বসিত, তোমার পকেটে কী ঘনশ্যাম!

ঘরের স্যাঁতসেঁতে শৈত্যে ঘনশ্যামের অন্য সব দুশ্চিন্তা টান-করা-চামড়ার ভিজিয়া- ওঠার মতো শিথিল হইয়া যায়, উত্তেজনা ঝিমাইয়া পড়ে, মনের মধ্যে কষ্টরোধের মতো চাপ দিতে থাকে, শুধু এক দুর্বহ উদ্বেগ। অশ্বিনীর মনে খটকা লাগিবে। অশ্বিনী সন্দেহ করিবে। পশুপতি তাকে অশ্বিনীর বসিবার ঘর হইতে বাহির হইয়া আসিতে দেখিয়াছিল। পশুপতি যদি ওকথা তাকে বলে, বলিবে নিশ্চয়ই, অশ্বিনীর কি মনে হইবে না ঘড়িটা ঘনশ্যাম নিলেও নিতে পারে?

এই ভাবনাটাই মনের মধ্যে অবিরত পাক খাইতে থাকে। শরীরটা কেমন অস্থির অস্থির করে ঘনশ্যামের। সন্দেহ যদি অশ্বিনীর হয়, ভাসা-ভাসা ভিত্তিহীন কাল্পনিক সন্দেহ, তার তাতে কী আসিয়া যায়, ঘনশ্যাম বুঝিয়া উঠিতে পারে না। এতদিন সে যে অশ্বিনীর ঘড়ি চুরি করে নাই, কোনো সন্দেহও তার সম্বন্ধে জাগে নাই অশ্বিনীর, কী এমন খাতিরটা সে তাকে করিয়াছে? শেষরাত্রে মণিমালার নাড়ি ছাড়িয়া যাওয়ার উপক্রম হইয়াছিল শুনিয়া পাঁচটি টাকা সে তাকে দিয়াছে, একতাড়া দশ টাকার নোটের ভিতর হইতে খুঁজিয়া বাহির করিয়া পাঁচ টাকার একটি নোট ছুড়িয়া দিয়াছে। আর দিয়াছে একখানা কাপড়-কাঁচা সাবান। চাকরকে দিয়া আনাইয়া দিয়াছে। সন্দেহ ছোট কথা, অশ্বিনী তাকে চোর বলিয়া জানিলেই বা তার ক্ষতি কী?

বাড়ির সামনে গাড়ি দাঁড়ানোর শব্দে চমকিয়া ওঠে। নিশ্চয়ই অশ্বিনী আসিয়াছে। পুলিশ নয় তো? অশ্বিনীকে বিশ্বাস নাই। ঘড়ি হারাইয়াছে টের পাওয়ামাত্র পশুপতির কাছে খবর

শুনিয়া সে হয়তো একেবারে পুলিশ লইয়া বাড়ি সার্চ করিতে আসিয়াছে। অশ্বিনী সব পারে।

না, অশ্বিনী নয়। নিখিল ডাক্তার মণিমালাকে দেখিতে আসিয়াছে।

কিন্তু ঘড়িটা এভাবে কাছে রাখা উচিত নয়। বাড়িতে রাখাও উচিত নয়। ডাক্তার বিদায় হইলে সে ঘড়িটা বেচিয়া দিয়া আসিবে। যেখানে হোক, যত দামে হোক। নিখিল ডাক্তার মণিমালাকে পরীক্ষা করে, অর্ধেক মন দিয়া ঘনশ্যাম তার প্রশ্নের জবাব দেয়। সোনার ঘড়ি কোথায় বিক্রি করা সহজ ও নিরাপদ তাই সে ভাবিতে থাকে সমস্তক্ষণ। বাহিরের ঘরে গিয়া কিছুক্ষণের সঙ্কেতময় নীরবতার পর নিখিল ডাক্তার গম্ভীরমুখে যা বলে তার মানে সে প্রথমটা বুঝিয়া উঠিতে পারে না।

মণিমালা বাঁচিবে না? কেন বাঁচিবে না, এখন তো আর টাকার অভাব নাই, যতবার খুশি ডাক্তার আনিয়া চিকিৎসা করাইতে পারিবে। মণিমালার না বাঁচিবার কী কারণ থাকিতে পারে!

ভালো করে দেখেছেন?

বোকার মতো প্রশ্ন করা। মাথার মধ্যে সব যেরকম গোলমাল হইয়া যাইতেছে। তাতে বোকা না বনিয়াই-বা সে কী করে। গোড়ায় ডাক্তার ডাকিলে, সময়মতো দু-চারটা ইনজেকশন পড়িলে মণিমালা বাঁচিত। তিন-চার দিন আগে ব্রেন। কমপ্লিকেশন আরম্ভ হওয়ার প্রথম দিকে চিকিৎসা আরম্ভ হইলেও বাঁচানোর সম্ভাবনা ছিল। তিন-চার দিন! মণিমালা যে ক্রমাগত মাথাটা এপাশ-ওপাশ করিত, চোখ কপালে তুলিয়া রাখিত, সেটা তবে ব্রেন খারাপ হওয়ার লক্ষণ। রুলি খুলিতে গেলে সে সজ্ঞানে বাধা দেয় নাই, হাতে টান লাগায় আপনা হইতে মুখ বিকৃত করিয়া গলায় বিশ্রী ভাঙা ভাঙা আওয়াজ করিয়াছিল। স্থির নিশ্চল না হইয়াও মানুষের জ্ঞান যে লোপ পাইতে পারে অত কি ঘনশ্যাম জানিত।

চেষ্টা প্রাণপণে করিতে হইবে। তবে এখন সব ভগবানের হাতে।

ডাক্তার ভগবানের দোহাই দেয়। এতদিন সব ডাক্তারের হাতে ছিল, এখন। ভগবানের হাতে চলিয়া গিয়াছে। নিখিল ডাক্তার চলিয়া গেলে বাহিরের ঘরে বসিয়াই ঘনশ্যাম চিন্তাগুলি গুছাইবার চেষ্টা করে। কালও মণিমালার মৃত্যু প্রায় নিশ্চিত ছিল, ডাক্তারের এ কথায় তার কিছুতেই বিশ্বাস হইতে চায় না। শেষরাত্রে নাড়ি ছাড়িয়া একরকম মরিয়া গিয়াও মণিমালা তবে বাঁচিয়া উঠিল কেন? তখন তো শেষ হইয়া যাইতে পারিত। মণিমালার মরণ নিশ্চিত হইয়াছে আজ সকালে। ডাক্তার বুঝিতে পারে নাই, এখনকার অবস্থা দেখিয়া আন্দাজে ভুল অনুমান করিয়াছে। ঘনশ্যাম যখন অশ্বিনীর ঘড়িটা চুরি করিয়াছিল, তার জীবনে প্রথম চুরি, তখন মণিমালা চিকিৎসার বাহিরে চলিয়া গিয়াছিল। ওর চিকিৎসার জন্য সে পাপ করিয়াছে কিনা, ওর চিকিৎসা তাই হইয়া গিয়াছে নিরর্থক। সকালে বাড়ি হইতে বাহির হওয়ার আগে নিখিল ডাক্তারকে আনিয়া সে যদি মণিমালাকে দেখাইত, নিখিল ডাক্তার নিশ্চয় অন্য কথা বলিত।

ঘড়িটা ফিরাইয়া দিবে?

খুব সহজে তা পারা যায়। এখনো হয়তো জানাজানিও হয় নাই। কোনো এক ছুতায় অশ্বিনীর বাড়ি গিয়া একফাঁকে টেবিলের উপর ঘড়িটা রাখিয়া দিলেই হইল।

আর কিছু না হোক, মনের মধ্যে এই যে তার পীড়ন চলিতেছে আতঙ্ক ও উদ্বেগের, তার হাত হইতে সে তো মুক্তি পাইবে। যাই সে ভাবুক, অশ্বিনী যে তাকে মনে মনে সন্দেহ করিবে সে সহ্য করিতে পারিবে না। এই কয়েকঘণ্টা সে কি সহজ। যন্ত্রণা ভোগ করিয়াছে? পশুপতি যখন তাকে অশ্বিনীর ঘর হইতে বাহির হইয়া আসিতে দেখিয়াছিল, তাকে সন্দেহ করার সম্ভাবনা যখন আছে অশ্বিনীর, ঘড়িটা রাখিয়া আসাই ভালো। এমনিই অশ্বিনী তাকে যে রকম অবজ্ঞা করে গরিব বলিয়া, অপদার্থ বলিয়া, তার উপর চোর বলিয়া সন্দেহ করিলে না জানি কী ঘৃণাটাই সে তাকে করিবে! কাজ নাই তার তুচ্ছ একটা সোনার ঘড়িতে।

টাকাও তার আছে। পঁচিশ টাকা।

ভিতরে গিয়া মণিমালাকে একবার দেখিয়া আসিয়া ঘনশ্যাম বাহির হইয়া পড়িল। ট্রাম-রাস্তা ধরিয়া কিছুদূর আগাইয়া সে শ্রীনিবাসের মানিব্যাগটা বাহির করিল। নোটগুলি পকেটে রাখিয়া ব্যাগটা হাতে করিয়াই চলিতে চলিতে এক সময় আলগোছে ব্যাগটা রাস্তায় ফেলিয়া দিল। খানিকটা গিয়া মুখ ফিরাইয়া দেখিল, ছাতি হাতে পাঞ্জাবি গায়ে একজন মাঝবয়সী গোঁফওয়ালা লোক খালি ব্যাগটার উপর পা দিয়া দাঁড়াইয়া কতই যেন আনমনে অন্যদিকে চাহিয়া আছে।

ঘনশ্যাম একটু হাসিল। একটু পরেই ব্যাগটা তুলিয়া লইয়া লোকটি সরিয়া পড়িবে। হয়তো কোনো পার্কে নির্জন বেঞ্চে বসিয়া পরম আগ্রহে সে ব্যাগটা খুলিবে। যখন দেখিবে ভিতরটা একেবারে খালি, কী মজাই হইবে তখন! খুচরা সাড়ে সাত আনা পর্যন্ত সে ব্যাগটা হইতে বাহির করিয়া লইয়াছে।

স্টপেজে ট্রাম থামাইয়া ঘনশ্যাম উঠিয়া পড়িল। খুচরা সাড়ে সাত আনা পয়সা থাকায় সুবিধা হইয়াছে। নয়তো ট্রামের টিকিট কেনা যাইত না। তার কাছে শুধু দশ টাকা আর পাঁচ টাকার নোট।

অশ্বিনীর বৈঠকখানায় লোক ছিল না। তার নিজের বসিবার ঘরটিও খালি। টেবিলে চিঠির উপর ঘড়িটা চাপা দেওয়া ছিল, চিঠিগুলি এখনো তেমনিভাবে পড়িয়া আছে। ঘড়িটি চিঠিগুলির উপর রাখিয়া ঘনশ্যাম বৈঠকখানায় গিয়া বসিল।

বেল টিপিতে আসিল পশুপতি।–বাবু যে আবার এলেন?

বাবুর সঙ্গে একবার দেখা করব।

ভিতরে গিয়া অল্পক্ষণের মধ্যেই পশুপতি ফিরিয়া আসিল।

বিকেলে আসতে বললেন ঘনোসশ্যামবাবু, চারটের সময়।

ঘনশ্যাম কাতর হইয়া বলিল, আমার এখুনি দেখা করা দরকার, তুমি আর একবার বলো গিয়ে পশুপতি। বোলো যে ডাক্তার সেনের কাছে একটা চিঠির জন্য এসেছি।

তারপর অশ্বিনী ঘনশ্যামকে ভিতরে ডাকিয়া পাঠাইল, অর্ধেক ফী-তে মণিমালাকে একবার দেখিবার জন্য অনুরোধ জানাইয়া তার বন্ধু ডাক্তার সেনের নামে একখানা চিঠিও লিখিয়া দিল। ক্ষমতা ও প্রতিপত্তির এইসব লীলাখেলা অশ্বিনী ভালোবাসে, নিজেকে তার গৌরবান্বিত মনে হয়।

চিঠিখানা ঘনশ্যামের হাতে দেওয়ার আগে সে কিন্তু একবার জিজ্ঞাসা করিল, ফী-র টাকা বাকি রাখলে চলবে না কিন্তু। আমি অপদস্থ হব। টাকা আছে তো?

ঘনশ্যাম বলিল, আছে। ওনার গয়না বেচে দিলাম, কী করি।